Vol. 8 | No. 2 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

Volume	8
Issue	2
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	December 16, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i2.2
Pages	52-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আধুনিক বাংলা কবিতা ভুঁইফোড় বস্তু নয়। এবং এ কারণেই বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র কলেবরে আমি সেই ভূমিকা কথঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করতে চাই। এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা প্রচুর। প্রথমত বাংলা ছন্দের প্রামাণ্য শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। যে সব ছাত্রপাঠ্য আলোচনা আছে তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। অধিকন্তু অকারণ পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনীতে দিশাহারা, এ বিষয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থটিই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।[১] তবে, বলাবাহুল্য, এ গ্রন্থেও আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস অলিখিত। পরন্তু প্রচলিত গ্রন্থসমূহে সূত্রাদির নিরর্থক জটিলতা ও পরিভাষার বৈচিত্র্য পাঠক চিত্তকে বিমূঢ় করে। তাই, প্রবন্ধের সূচনায়, আলোচনার সুবিধার্থে আমি কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করে নিতে চাই।

ক বাংলা ছন্দ প্রধানত তিন শ্রেণীবদ্ধ······
স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, ও অক্ষরবৃত্ত।

খ। এই তিন শ্রেণীর ছন্দেই মুক্তাক্ষর (open syllable)
সর্বদা একমাত্রা হা, না, সে, ইত্যাদি।

গ। বদ্ধাক্ষর (closed syllable) স্বরবৃত্ত ছন্দে সর্বদা এক মাত্রা, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বদা দুমাত্রা, এবং অক্ষর বৃত্ত ছন্দে শব্দের আদি মধ্যে একমাত্রা ও শেষে দুমাত্রা,
অর্থাৎ, "বন্ধুর" শব্দটি স্বরবৃত্তে দুমাত্রা, মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রা এবং অক্ষরবৃত্তে তিন মাত্রা।
সুতরাং বদ্ধাক্ষরের মাত্রাগণনাভেদে বাংলা ছন্দত্রয় চিহ্নিত।

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত সূত্রাংশে ব্যবহৃত প্রচলিত পরিভাষাসমূহ পরিপূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থদ্যোতক এমন নয়, তবু অতিরিক্ত জটিলতামুক্ত আলোচনার সুবিধার জন্য এগুলোই গ্রহণ করছি।

বাংলা ছন্দত্রয়ের মধ্যে প্রসার গুণে অক্ষরবৃত্ত অদ্বিতীয়। এর মধ্যযুগীয় নাম পয়ার। ৮।৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত ১৪ মাত্রার দুটি সমিল চরণ, প্রথম চরণের শেষে এক দাড়ি ও দ্বিতীয় চরণের শেষে দু দাড়ি— এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পয়ারের একমাত্র চেহারা। এই অতি নিরূপিত সরল ছন্দভঙ্গির পরিপূরক এ সব কবিতার পঠনরীতি। সেকালে কবিতা সুর সহযোগে পড়া হত। ফলে সুরবিহ্বল কবির রচনায় মাত্রাতিরেক বা পতন ছিল সাধারণ ঘটনা।

চর্যাপদের ছন্দবিধিতে সংস্কৃতরীতির অনুবর্তনই মুখ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ স্বর উপস্থিত এবং অন্ত্যস্বর সর্বদাই উচ্চারিত হত। যেমন:

কাআ তরুবর | পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ | পৈঠাকাল॥

—চর্যা ১, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত [২]

লক্ষণীয় যে, প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্বের আদিবদ্ধাক্ষর পান্ এবং দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বের আদি দ্বিস্বরধ্বনি (dipthong) পৈ একমাত্রা, অথচ ছন্দ মেলাবার জন্য দ্বিতীয় চরনের প্রথম পর্বের আদি বদ্ধাক্ষর চন্ দুমাত্রা। চর্যাপদে এই ধরণের ব্যতিক্রমবাহুল্য এবং দীর্ঘস্বর ইত্যাদি সুরাশ্রয়ে নিশ্চিন্ত। অবশ্য চর্যাতেও ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের বাংলা রীতির চরণ খুঁজে বের করা চলে। যেমনঃ

১। অবনাগবনে কাহ্ন | বিমণা ভইলা

চর্যা ৭। [৩]

২। বিসঅ বিসুদ্ধি মই | বুঝিঅ আনন্দে

চর্যা ৩০। [৪]

কিন্তু চর্যায় দীর্ঘস্বর অবশ্যগণ্য এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রথম উদ্ধৃতির

সম্বোধন পদ কাহ্ন ছন্দবহির্ভূত বিবেচনা করেছেন।[৫] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলা অক্ষরবৃত্তের রীতি স্পষ্টতর। যেমন:

১। পাখী নহু তার ঠাঁই | উড়ি পড়ি যাউঁ।
মেদনী বিদার দেও | পঁসিয়া লুকাউঁ॥[৬]

২। বন্ পোড়ে আগ বড়াই | জগজনে জানি।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন | কুম্ভারের পানি॥[৭]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথম পর্বের একমাত্রাতিরেক স্বরাশ্রয়ী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর ১৪ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত (অর্থাৎ পয়ার) রচনা মধ্যযুগের প্রায় সকল কবির অভ্যাসানুগত হয়। বলাবাহুল্য এ অভ্যাসে ত্রুটি সচেতনা অনুপস্থিত। তাই স্বরাশ্রয়ী মাত্রাতিরেক বা পতন ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত এই ছন্দচর্চা বৈচিত্র্যহীন।

পয়ারের এই ক্লান্তিকর আকৃতি পরিবর্তনের কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। মধুসূদনের হাতে বিবর্তিত অক্ষরবৃত্তের লক্ষণানুসারী নাম—অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। প্রচলিত নাম অমিত্রাক্ষর এ ছন্দের মাত্র একটি গুণনির্দেশক। বস্তুত মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব বাংলা কবিতার পঠনরীতির পরিবর্তনকে তরান্বিত করা। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকদের জন্য বাংলা কবিতা লিখতে যেয়েও রঙ্গলাল কবিওয়ালা-সুলভ অভ্যাস দোষে সম্পূর্ণ সুর বর্জনে অসমর্থ। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য তানবিস্তারের অবকাশমুক্ত উদাত্ত আবৃত্তিযোগ্য প্রথম বাংলা কবিতা। বলা-বাহুল্য কেবল ভাব-ভাষায় নয়, বাংলা ছন্দ ও কবিতার পঠনরীতির বিবর্তনের দিক দিয়েও মধুসূদনই প্রথম আধুনিক কবি। প্রায় হাজার বছরের বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে মধুসূদন বাংলা অক্ষরবৃত্তের নতুন সম্ভাবনাময় দিগন্তের ইঙ্গিত দিলেন। মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের হাতে এই অক্ষরবৃত্ত পূর্ণতর রূপলাভ করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

১। সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামনি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবী, অমৃতভাষিণী
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষোকুলনিধি
রাঘবারি। [৮]

২। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য লয়ে বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আর একটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ এই বাহু দুটি
এই কোলে এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! [৯]

৩। সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়—
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গন কোরো না শিথিল, ততক্ষণ
ক্রুতহস্তে লুটি লও সর্বস্বার্থ ধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।—ওরে তোরা জয় বাদ্য বাজা। [১০]

৪। দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি? [১১]

১৪ মাত্রার প্রবহমান স্বাধীনযতি অক্ষর বৃত্তের এই চারটি উদ্ধৃতির প্রথম দুটি অমিল ও শেষ দুটি সমিল। সমিল বা অমিল যাই হোক

না কেন, যতিপাতের স্বাধীনতা ও প্রবহমানতাকে নির্ভর করে প্রাথমিক আড়ষ্টতামুক্তিই এ নিরীক্ষার মূলকথা। এবং রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সমিল অমিল উভয় রীতিতেই প্রয়োগসাফল্য অর্জন করলেন, তা নয়, পরন্তু ১৪ মাত্রার বদলে ১৮ মাত্রা ব্যবহার করে তিনি প্রবহমান স্বাধীনযতি অক্ষরবৃত্তের দিগন্ত অধিকতর প্রসারিত করলেন।

১। সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দুর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী। [১২]

২। প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী
মাধুর্যসুধায়, কত সহজে করিলে আপনারি
দূর দেশী পথিকেরে। [১৩]

এই মধুসূদন-রবীন্দ্রপথ অনুসরণ করেই বাংলা প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা। জীবনানন্দ দাশের চারটি চরণ লক্ষ্য করুন:

আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড়,
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে রূপশালী ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ। [১৪]

প্রথম দুটি চরণে ১৮ মাত্রা, তৃতীয় চরণে ২৬ মাত্রা এবং চতুর্থ চরণে ৩০। উদ্ধৃত কবিতাটি সমিল। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা সমিল অমিল উভয় ভঙ্গিতেই ১৮, ২২, ২৬, ৩০ বা অধিক মাত্রার প্রবহমান স্বাধীনযতি অক্ষরবৃত্ত রচনা করেন। সমমাত্রিক চরণের কবিতায় ১৮র অধিক মাত্রা-ব্যবহার বিরল। ২২, ২৬, ৩০ বা অধিক মাত্রার চরণ অসমমাত্রিক প্রবহমান রবৃত্তে ব্যবহৃত হয়। এবং অসমমাত্রিক প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত রচনার পাঠ

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকেই। রবীন্দ্রনাথের এ নিরীক্ষার ফসল বলাকা কাব্য। উক্ত গ্রন্থে তিনি দুমাত্রা থেকে ১৮ মাত্রা পর্যন্ত সমিল চরণ ব্যবহার করেছেন :

তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,······ইত্যাদি।[১৫]

আধুনিকেরা এ ভঙ্গিতে মিল বৈচিত্র্যের নিরীক্ষাও যথেষ্ট করেছেন। বস্তুত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দই সর্বাপেক্ষা কবি-প্রিয়। কাব্যনাট্যরচনায় এ ছন্দ সফল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪ মাত্রার রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এবং ১৮ মাত্রার ফররুখ আহমদের "নৌফেল ও হাতেম"[১৬] তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের আর একটি সফলতার উল্লেখ অপরিহার্য—সে তাঁর বাংলায় সনেট প্রবর্তন। এর মধুসূদন প্রদত্ত নাম চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। অমিত্রাক্ষরের মতই চতুর্দ্দশপদীও কেবল বাহ্যলক্ষণদ্যোতক শব্দ। কিন্তু এই শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে চর্যাপদে এ রীতির কবিতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। অধিকাংশ চর্যাই পাঁচ শ্লোকের অর্থাৎ ১০ চরণের; কয়েকটি ৬ শ্লোকেরও (১২ চরণের) আছে। এবং ১০, ২৮ ও ৫০ নম্বর চর্যা ৭ শ্লোকের অর্থাৎ চতুর্দ্দশপদী। বলাবাহুল্য এই চতুর্দ্দশপদী ও সনেটে দুস্তর ব্যবধান। অষ্টক ও ষঠক বন্ধে ভাবের উত্থানপতন এবং মিল বিন্যাসে ঋজু নির্ধারিত আইন সনেটের অপরিহার্য অঙ্গ। মধুসূদন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা সনেট চমৎকার উৎকর্ষ লাভ করেছে। পেত্রার্কান ও সেক্সপীরীয় সনেট রচনারীতি বাংলা সনেটের প্রধান আদর্শ। মধুসূদনের সঙ্গে পরবর্তী কবিদের ব্যবধান : তাঁর ১৪ মাত্রার বদলে ১৮ বা অধিক মাত্রার চরণ ব্যবহার এবং ভাষাভঙ্গির মধ্যে আড়ষ্ঠতামুক্তি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

অক্ষরবৃত্ত প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির আগে তথাকথিত গদ্যছন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আবশ্যক। রবীন্দ্র রচনায় এর একটা নিরূপিত রূপ আছে। গদ্যছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে যেমন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তেমনি লিপিকা, পুনশ্চ, পত্রপুট, আরোগ্য,-এর প্রচুর কবিতায় এ ছন্দ-নিরীক্ষার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর দুটি মন্তব্য স্মর্তব্য :

১। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ, সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। [১৭]

২। গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। [১৮]

স্পষ্টতই গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে শেষ পর্যন্ত একটা সংস্কার দানা বেঁধেছিল : পদ্যের সলজ্জ সসজ্জ ভাব ত্যাজ্য কিন্তু অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ছন্দ প্রতিপাল্য। ফলে রবীন্দ্রগদ্যকবিতার রূপ নিরূপিত। একে বলা চলে অমিল অসমমাত্রিক অপ্রবহমান অক্ষরবৃত্ত। অপ্রবহমান শব্দটি লক্ষণীয় : দৃষ্টান্ত—

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল,
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানা রকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য। [১৯]

প্রতিটি চরণের শেষেই শ্বাসযতি পড়ছে। একে অক্ষরবৃত্ত শ্রেণীবদ্ধ করার কারণ মাত্রাগণনারীতিতে এর ভঙ্গি অক্ষরবৃত্তেরই। রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে এ ছন্দের পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে প্রকারান্তরে বলেছিলেন— অমিত্রাক্ষরে পয়ারের লয় আছে, এতে তা নেই। [২০]

কিন্তু তাঁর গদ্যকবিতায় ১৪, ১৮, প্রভৃতি মাত্রার চরণ অপ্রচুর নয়;

১। দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে। [২১]

২। মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালক। [২২]

৩। সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায় [২৩]

৪। তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে [২৪]

৫। চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত [২৫]

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকদের গদ্য কবিতা বাক্যগঠনরীতি ও বক্তব্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন-ইচ্ছুক।

১। বর্তমান মুক্ত কচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা
মাঝে মাঝে মনে হয়
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি। [২৬]

২। গ্রীষ্মের রাত্রিতে তোমাকে দেখা
একটি দ্বীপের মতো
নির্বিরোধ অলসতায় অনুত্তাপ দেহ
হৃদয়ের অন্তর্দাহে সমস্ত গান যদি পাখী হয়
যদি সমুদ্রের বিশ্রামের মতো
অনেক দীপ্তির সৈকত জাগে······ [২৭]

৩। কৃষাণ যেমন বর্ষার পলি সিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায় তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি ; দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে দেখিয়েছে— বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিলে ; যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো কোহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণপ্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে। দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম॥ [২৮]

লক্ষণীয় যে তথাকথিত গদ্যছন্দের মূলভঙ্গি অসমমাত্রিক স্বাধীনপার্বিক অপ্রবহমান অক্ষরবৃত্তের। আধুনিকেরা কখনো কখনো ওজস্বী বক্তব্যে বা আবেগ সঞ্চারী অনুভবে এর মধ্যে একটা প্রবহমানতা আনতে সচেষ্ট। তৃতীয় উদ্ধৃতিটি এর প্রমাণ। কিন্তু স্বল্পবাক গদ্যছন্দে অপ্রবহমানতাই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিস্তারধর্মিতা, এই প্রসার গুণ বাংলা কবিতার আধুনিকীকরণের এক প্রধান সহায়। এবং প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বাংলা কবিতার পঠনরীতির পরিবর্তনই সম্ভব করেছে অক্ষরবৃত্তের এই দিগন্ত বিস্তার।

অক্ষরবৃত্তের- মাত্রাগণনার যে রীতি সূত্রাংশে উল্লেখ করেছি তার প্রথম ভাগের কিছু ব্যতিক্রম কখনো কখনো, বিশেষত কথ্য ক্রিয়াপদ নির্দেশক প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বা সমাসবদ্ধপদ ব্যবহার কালে, দৃষ্ট হয়। যেমন, করলে, বললে ; লোকটা, তিনটে ; দিন-রাত প্রভৃতি শব্দের প্রথম বদ্ধাক্ষর দুমাত্রা ধরাই সুবিধাজনক।

দুই

তুলনায় বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতাপ কম।

মাত্রাবৃত্তের মূল সংস্কৃত ছন্দে। চর্যাপদে মাত্রাবৃত্তের ধ্বনিদ্যোতনার নমুনা ঃ

১। উমত সবরো। পাগল সবরো। মা কর গুলি গু। হারী।
তোহর নিঅ। ঘরিণী ণামে। সহজ সুন। দরী ॥ [২৯]

লক্ষণীয় যে গুরুস্বর অস্বীকার করলে প্রথম চরণটি বাংলা মাত্রাবৃত্তের পরিণততর পর্যায়ের অনুরূপ। কিন্তু চর্যায় গুরুস্বর উপেক্ষাযোগ্য নয়। এবং মাত্রাতিরেক বা পতন স্বরাশ্রয়ী। এই স্বরাশ্রয়ী পতন ও অতিরেক বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত মাত্রাবৃত্তেও মেলে। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে কয়েকটি ভঙ্গিতে সাজিয়ে পরিণততর রূপদান করেন। মাত্রাবৃত্তের প্রতি চরণে একাধিক সমমাত্রিক পর্ব থাকায় এ ছন্দের একটা নির্ধারিত দোলা আছে এবং এ ছন্দের বদ্ধাক্ষর সর্বদা দ্বিমাত্রা হওয়ায় সেই দোলা বেশ ধীর লয়ের। সমমাত্রিক পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৬ ও ৫ এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত :

১। ভূতের মতন। চেহারা যেমন। নির্বোধ অতি। ঘোর [৩০]
২। পঞ্চশরে। দগ্ধ করে। করেছো একী। সন্ন্যাসী [৩১]

৪ ও ৭ মাত্রার চালের কবিতাও অবিরল নয়। বস্তুত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলায় বৈচিত্র্য আসে পূর্ণ পর্বের সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি এবং অপূর্ণ পর্বে মাত্রাসংখ্যা প্রয়োজনানুসারে (১ থেকে ৫ পর্যন্ত ৬ মাত্রার চালে। ৫ মাত্রার চালে ৪ পর্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা থেকে অন্তত এক মাত্রা কম পর্যন্ত) ব্যবহার করে। আধুনিক কবিরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে প্রধানত এই কৌশলানুগত। ৬ মাত্রার চালই বেশী ব্যবহৃত হয়। এ চালের মধ্যে বৈচিত্র্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১। ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগর উধাও অগাধ থেকে,
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভি। ষেকে। [৩২]

২। মেলাবেন তিনি। ঝড়ো হাওয়া আর।
পোড়ো বাড়ীটার।
ঐ ভাঙ্গা দর। জাটা।
মেলাবেন।

পাগল ঝাপটে। দেবে না। গায়েতে। কাঁটা
আকালে আগুনে। তৃষ্ণায় মাঠ। ফাটা
মারী—কুকুরের। জিভ দিয়ে খেত। চাটা,
বন্যার জল। তবু ঝরে জল।
প্রলয় কাঁদনে। ভাসে ধরাতল।
মেলাবেন। [৩৩]

৩। আমি কবি যত। কামারের আর। কাঁসারির আর। ছুতোরের,
মুটে মজুরের।
—আমি কবি যত। ইতরের! [৩৪]

৪। জনসমুদ্রে। নেমেছে জোয়ার।
হৃদয়ে আমার। চড়া
চোরাবালি আমি। দূর দিগন্তে। ডাকি
কোথায় ঘোড় স। ওয়ার। [৩৫]

৫। দখিনা দোলার। দোদুল দোলায়।
জাগে বনভূমি। মুঞ্জরি
ফাগুয়ার রাগে। উত্তরি রাঙ্গা।
চরণে নূপুর। গুঞ্জরি— [৩৬]

৬। আখরোট বনে।
বাদাম খুবানি। বনে
কেটেছে তোমার। দিন।
হে পাখী শুভ্র। তনু,
সফেদ পালকে। চমকে বিজুরী। চমকে বর্ণ। ধনু,
সোনালি রুপালি। রক্তিম রং। পীন। [৩৭]

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের মাত্রাবৃত্ত রচনায় প্রতি চরণের শেষেই শ্বাস যতি নির্ধারিত। কাজী নজরুল ইসলাম এই নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করে প্রচুর কবিতা লিখলেও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা সঞ্চার। বিদ্রোহী কবিতা এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ৬ মাত্রার চালে রচিত কবিতাটিতে

অসম চরণ ব্যবহারে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের ফলে এবং প্রায় প্রতি চরণেই অতিপর্ব প্রয়োগের জন্য অভিনব গতি এসেছে। বিশেষত পূর্ব চরণের অপূর্ণ পর্বের পর পরবর্তী চরণের অতিপর্ব দুটি চরণের মধ্যবর্তী কালীন ফাঁক ভরাট করেছে এবং চরণ থেকে চরণে কবিতার গতিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে ।

আমি। অনিয়ম উচ্। ছৃংখল
আমি। দলে যাই যত। বন্ধন যত। নিয়ম কানুন। শৃংখল
আমি। মানি নাকো কোন। আইন
আমি। ভরাতরী করি। ভরাডুবি, আমি। টর্পেডো, আমি। ভীম ভাসমান। মাইন [১৮]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, উদ্ধৃতাংশে প্রথম চরণের অপূর্ণ পর্বের ৪ মাত্রা ও দ্বিতীয় চরণের অতিপর্বের দুমাত্রা একত্রে একটি পূর্ণ পর্বের সমান ওজনের, দ্বিতীয় তৃতীয় চরণেও একইভাবে প্রবাহ অক্ষুন্ন, তৃতীয় চরণের অপূর্ণ পর্বে এক মাত্রা বিরতি শ্বাসযতির সুযোগ দিচ্ছে চতুর্থ চরণেও তাই। নজরুলের আর একটি কবিতায় এ ছন্দের পরিশীলিত প্রয়োগ খুবই সার্থক ঃ

যার। অন্তরে। ক্রন্দন।
করে হৃদি। মন্থন।
তারে হরি। চন্দন।
কমলি মা। লা
সখী। দিসনে লো। দিসনে লো। বড় সে জ্বা। লা। [১৯]

এখানে ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে নজরুল চমৎকার প্রবহমানতা এনেছেন এবং স্তবক রীতি গ্রহণের ফলে সমগ্র কবিতাটিতে রসবিস্তার সুমিত হয়েছে।

আধুনিক কবিদের যে সব মাত্রাবৃত্ত কবিতার অংশ ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তার দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও ষষ্ঠ উদ্ধৃতি প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের পরিশীলিত রূপ। সাম্প্রতিক কবিতায় এ ছন্দ ব্যবহারের সম্ভাবনা ফলহীন নয়। অপ্রবহমান মাত্রাবৃত্তে (এবং প্রবহমানেও) মিল বৈচিত্র্য এনে, কিম্বা সম্পূর্ণ মিল বর্জন করে, আধুনিক কবিতায় এ ছন্দের সফল ব্যবহার কিছু কিছু হয়েছে।

তিন

স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলা কবিতার নিজস্ব বস্তু; ছড়ার ছন্দে এর মূল নিহিত। এবং ঘুমপাড়ানী বা ছেলেভুলানো ছড়ার পঠনরীতির মধ্যেও একটা লঘু সুর বর্তমান। যার ফলে মাত্রাবৃত্তের মত এ ছন্দের প্রাচীন রূপেও সুরাশ্রয়ী পতন বা অতিরেক আছে। যেমন :

১। শিব ঠাকুরের। বিয়ে হবে। তিন কন্যে। দান
২। কাজী ফুল। কুড়োতে কুড়োতে। পেয়ে গেলুম। মালা।
হাত ঝুম ঝুম। পা ঝুম ঝুম। সীতারামের। খেলা॥

এখানে প্রথম চরণের তৃতীয় পর্বে এক মাত্রাপতন টেনে বলায় যেমন পূর্ণ হয় তেমনি দ্বিতীয় তৃতীয় চরণের বিশৃংখল মাত্রার পর্বগুলো কখনো ক্ষিপ্র উচ্চারণে (২ঃ২) কখনো টেনে পড়ায় (২ঃ১, ৩ঃ১, ৩ঃ২) পর্বের ওজন সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য, মাত্রাবৃত্তের মতই স্বরবৃত্তেরও পূর্ণ পর্বের ওজন সমতা অপরিহার্য। পার্থক্য এই যে, বদ্ধাক্ষরের সর্বদা এক মাত্রা হওয়ায় স্বরবৃত্ত দ্রুতলয়ের ছন্দ।

ছড়ার সুরাশ্রয়ী পতন-অতিরেক সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তকে আধুনিক কবিতায় ব্যবহার-উপযোগী করে তুললেন। তাঁর ক্ষণিকা কাব্য এ ছন্দের প্রয়োগসাফল্যে উজ্জ্বল। পরিহাস-তরল প্রৌঢ় কবিচিত্ত এ ছন্দে নতুন মুক্তি পেল; লঘু সুরে তিনি অনেক গুরু কথা বললেন। অসম মাত্রার চরণ ব্যবহার করে, মিলের বৈচিত্র্য এনে এবং স্তবক বিন্যাসে চঞ্চল থেকে তিনি বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন।

কিন্তু স্বরবৃত্তের যে সম্ভাবনা রবীন্দ্রকাব্যে দেখা গিয়েছিল তার যথাযোগ্য পরিণতির চিহ্ন রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে বিরল। বরঞ্চ স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে আধুনিক কবিদের কিঞ্চিত আড়ষ্ঠতা আছে। হয়ত এ ছন্দের চপল ধ্বনি-মাধুর্য আধুনিক কবিদের বিভ্রান্ত করে থাকবে। তবু এ ছন্দে যে সব উৎকৃষ্ট আধুনিক বাংলা কবিতা লিখিত হয়েছে সেসবের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এ ছন্দের বাহ্যগুণের প্রদর্শনীর বদলে অন্তর্গুণের ঐশ্বর্য বিস্তার। যেমন :

১। সেই চালে ভাই। মিত্র কিবা। শত্তুর
চলছে সবাই। মস্ত সহায়। হাতির শুড়। [৪০]

২। দিনের মরী। চিকার ব্যূহে। বন্দী আমি। মস্ত ডোরে।
তোমায় দেখি। কেমন করে। [৪১]

৩। এখন তো রাত। অনেক ঘাটে। বাটে
বন্ধ হলো। লোকের চলা। ফেরা,
উধাও হলো। দূরের পথি। কেরা
দিকবিদিকে। তেপান্তরের। মাঠে [৪২]

মিল বিন্যাসে বা বর্জনে, পর্বসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতে, পূর্ণ অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যার তারতম্যে এ ছন্দে নানা বৈচিত্র্য আনা সম্ভব এবং এ সমস্ত পথে প্রচুর নিরীক্ষার সুযোগ বর্তমান। দ্রুতলয়ের ছন্দ বলে স্বরবৃত্তে প্রবহমানতা অস্বাভাবিক নয়। যদিও তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। অমিল প্রবহমান স্বরবৃত্তের একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

চড়ুই জোড়া। আয়না জুড়ে।
চতুর্দিকে। কাকের স্বরে। মিলিত সং। গীত,
পাখী ওড়ে। বর্ণলেখা। মেঘে।
ঘাসের ঠোঁটে। কিশলয়ে।
সোনারোদে। মুক্তো দোলে।
চলাচলে। ছড়ায় অণু। অণু। [৪৩]

স্বরবৃত্ত প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির আগে তথাকথিত স্বরমাত্রিক ছন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আবশ্যক। এ ছন্দের সূত্র : "স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ভঙ্গিতে পড়া চলে এমন ছন্দ"। [৪৪]

কিন্তু দিলীপ রায় যে দুটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ক্ষণিকার 'যথাসময়' কবিতাটি সম্পূর্ণ স্বরবৃত্তে লেখা। অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথদত্তের 'ছন্দহিল্লোল' মাত্রাবৃত্তের চালে রচিত। বস্তুত ছান্দসিকীতে উক্ত কবিতাংশ দুটির কেবল চক্ষুগ্রাহ্য ছন্দোবিশ্লেষণ করা হয়েছে ; কিন্তু,

বলাবাহুল্য, ছন্দ শ্রুতিগ্রাহ্য এবং কবিতার ছন্দোবিশ্লেষণের মূল শর্তই বিশুদ্ধ স্বাভাবিক পঠণরীতি। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বরমাত্রিক ছন্দ তাকেই বলা যাবে যে ছন্দেরপঠণরীতিতে উভয়ছন্দের প্রকৃতির সার্থক মিশ্রণ ঘটেছে। দিলীপ রায় এ শর্ত অনুভব করলেও এ ভঙ্গির কোন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেননি। আধুনিক কবিরা এ প্রসঙ্গে খুব মনোযোগী মনে হয় না।

কোনো কোনো কবিতায় একাধিক রীতির ছন্দের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় বক্তব্যের নাট্যিক দ্যোতনা সঞ্চারের জন্য। একে ফ্রী ভার্স (Free Verse) বলা চলে। এ কৌশল অপাংক্তেয় নয়, তবে সফলতার জন্য কবির উৎকণ্ঠ সাবধানতা জরুরী।

চার

আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমিল, অমিল ইত্যাদি শব্দে সচরাচর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু, স্মর্তব্য যে, অন্ত্যমিল থাকা না থাকা আধুনিক কবিতার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। অন্ত্যমিল বর্জিত হলেও অন্তর্মিল থেকে যায়, এবং কোন মিল না থাকলেও কাব্যরস নির্বিঘ্ন থাকে। বস্তুত আধুনিক কবিতার আঙ্গিক নিয়ত উৎকর্ষমুখী, ফলত অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিতার ছন্দ বা আঙ্গিক সৃষ্টিছাড়া উৎকেন্দ্রিক নয়, কেননা বাংলা ছন্দ-ঐতিহ্য বাংলা কবিতার সমবয়স্ক। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ তাই কেবলমাত্র বাংলা ছন্দের ঐতিহ্যের পটভূমিতেই বিচার্য।

টীকা

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, বিশ্বভারতি, কলিকাতা, ১৯৬১

২। শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ সম্পাদিত, Buddhist Mystic Songs, Bengali Literary Society, Department of Bengali, University of Karachi, 1960. পৃষ্ঠা ২

৩। ঐ, পৃষ্ঠা ১৫, চর্যা ৭

৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৪, চর্যা ৩০

৫। শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, নতুন সংস্করণ, ঢাকা এপ্রিল ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৫

৬। বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ১১৬

৭। ঐ

৮। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম বাক্য, প্রথম সর্গ।

৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জন, বিশ্বভারতি, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ১৫—১৬

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধারীর আবেদন, সঞ্চয়িতা,

১১। ইসলাম, কাজী নজরুল, দারিদ্র্য, সিন্ধুহিল্লোল, সঞ্চিতা,

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা,

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অতিথি, পূরবী

১৪। দাশ, জীবনানন্দ, অবসরের গান,

১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শাজাহান, বলাকা,

১৬। আহমদ, ফররুখ, নৌফেল ও হাতেম, পাকিস্তান লেখক সংঘ, ঢাকা ১৯৬১

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, ভাদ্র ১৩৬৩ সংস্করণ, ভূমিকা

১৮। ঐ, গ্রন্থ পরিচয়

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা ২০, নাটক,

২০। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৭

২১। ঐ, ভীরু

২২। ঐ, খেলনার মুক্তি

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তোমার অস্তযুগের সখা, পত্রপুট

৩৪। ঐ, আমি, শ্যামলী

২৫। ঐ, আফ্রিকা, সঞ্চয়িতা

২৬। সেন, সমর, নিরালা, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা, দ্বিতীয়

মুদ্রণ, কলিকাতা
২৭। আহসান, সৈয়দ আলী, উপমা, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, ঢাকা ১৯৬২
২৮। রহমান, হাসান হাফিজুর, অমর একুশে, বিমুখ প্রান্তর, পারাবত কাশনী, ঢাকা ১৯৬২
২৯। শহ্‌ দুল্লাহ্‌, ডক্টর হম্মদ সম্পাদিত, Buddhist Mystic Songs, পৃষ্ঠা ৫১, চর্যা ২৮
৩০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুরাতন ভৃত্য, কাহিনী, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪১ পৃষ্ঠা ৯৬
৩১। ঐ, মদনভস্মের পর, কল্পনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১
৩২। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, শাশ্বতী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ,
৩৩। চক্রবর্তী, অমিয়, সংগতি, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা
৩৪। মিত্র, প্রেমেন্দ্র, কবি, প্রথমা
৩৫। দে, বিষ্ণু, ঘোড়সওয়ার, চোরাবালি
৩৬। হোসেন, শাহাদাৎ, বসন্তের বাসরিকা, আব্দুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত প্রেমের কবিতা, ঢাকা ১৯৫৯
৩৭। আহমদ, ফররুখ, আকাশ নাবিক, সাতসাগরের মাঝী,
৩৮। ইসলাম, কাজী নজরুল, বিদ্রোহী, সঞ্চিতা
৩৯। ঐ,
৪০। রাহমান, শামসুর, হাতির শুড়, রৌদ্র করোটিতে, পাকিস্তান লেখক সংঘ, ঢাকা ১৯৬৩
৪১। আজাদ, আলাউদ্দিন আল, বৃত্ত, মানচিত্র, ঢাকা ১৯৬১
৪২। হোসেন, তালিম, সনেট : ছয়, শাহীন, ঢাকা ১৯৬৩
৪৩। মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, সকাল, দুর্লভ দিন, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬১
৪৪। রায়, দিলীপ কুমার, ছান্দসিকী, পৃ ১৯৯